ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী করতে হবে

এ দেশে মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থা বেশ প্রসার লাভ করছে। দেশের সর্বত্র প্রায় গ্রামে-গঞ্জে মসজিদভিত্তিক মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। সেখানে দীনি-ইলম (ধর্মীয় শিক্ষা) চালু হয়েছে। কওমি শিক্ষায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে না। এলাকার প্রতিটা বাড়ি থেকে চাল-ধান-ক্ষেত উঠিয়ে কিংবা চাঁদা উঠিয়ে কখনো-বা স্বাবলম্বী পরিবারের আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও মৌলবি-মাওলানাদের খাবারের ব্যবস্থা এবং পারিশ্রমিকের সংস্থান হচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায়, গ্রামে-গঞ্জে এভাবে অবহেলিত অনানুষ্ঠানিক, অনৈয়মিক ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে কওমি মাদ্রাসা টিকে আছে। ধর্মভীরু মানুষের দান ও ত্যাগে টিকে আছে। উল্লেখ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠানের লিল্লাহ-বোর্ডিংয়ে এদেশের গরিব, অসহায়, এতিম শিশুদের বিনা-খরচে থাকা-খাওয়া ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এ-ধরণের ব্যবস্থা অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নেই। নিঃসন্দেহে এটা একটা সমাজ-সেবা ও সমাজকর্ম। এছাড়া সামাজিক সমস্যার সুন্দর একটা সমাধানও বটে। শিক্ষা-নিয়ে-বেরোনো ছাত্রছাত্রীদের সবাই খোদা-ভীরু, সচ্চরিত্রবান এবং অল্পে তুষ্ট। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অল্প বয়সে বখে যায় না। কোনো সমাজ-বিগর্হিত কাজে সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের জন্য অ-ক্ষতিকর জনগোষ্ঠী তৈরির কাজে নিয়োজিত– এটাও একটা সমাজকর্ম।

অনেক ভালো দিকের মধ্যেও বেশ কিছু বিষয় আছে পরিবর্তিত সমাজ ও বিশ্ব-ব্যবস্থায় তাদের উন্নতির জন্য ভাবনা-চিন্তা আবশ্যক বলে মনে হয়। এই ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষার মধ্যে মানবজাতির জন্য যত কল্যাণমূলক কাজ দিনে দিনে অন্য ধর্মের লোকের জন্য ছেড়ে দিয়ে কর্মঠ হাত গুটিয়ে নিয়েছে। স্রষ্টার সৃষ্টি পরিচালনায় ভূমিকা রাখছে না বললেই চলে; 'হক্কুল ইবাদ'-এর দায়িত্বও পালিত হচ্ছে না। তারা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ও তসবিহ-তেলাওয়াত করে আর্থিক অনটনের মধ্যে দুনিয়াদারি বজায় রেখেছে। এরা অজ্ঞতাবশত স্রষ্টার সৃষ্টি-দর্শনকেই পাল্টে দিয়েছে। অন্য ধর্মের লোকেরা সৃষ্ট বিশ্বের উচ্চতর পেশাকে বেছে নিয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা দেখাচ্ছে, সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন করছে। সকল কল্যাণমুখী কাজ করে মুসলমানদের উপর প্রভূত্ব করছে। মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি থেকে পিছপা হয়ে কবরমুখো পা এগিয়ে দিয়ে বসে আছে। জীবনযাপনে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অন্য ধর্মের লোকের উপর নির্ভরশীল হয়েছে। তাই বিশ্বব্যাপী এরা প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। এ-সবই চিন্তা-চেতনার পশ্চাৎপদতা।

এই নিবেদিতপ্রাণ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মনের অজান্তেই কিংবা অজ্ঞতাবশত তাদের চিন্তা-চেতনা-শিক্ষা ও জীবন-ধারণা দিয়ে মুসলমান জাতিকে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে একটা অনগ্রসর, অকর্মণ্য ও সৃষ্টির অযোগ্য জাতিতে পরিণত করে ফেলছে; যদিও ধর্মগ্রন্থ এদেরকে 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হিসেবে মানবজাতির কল্যাণ করার জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রযুক্তি-বিজ্ঞান-ব্যবসা শিক্ষা থেকে সরে এসে নিজেদের অজান্তেই নিজেরা এদেশে ধর্মহারা সেকিউলারপন্থীদের জন্য অভয়ারণ্য তৈরির পথ করে দিয়েছে। এটা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও কর্ম দিয়ে করেছে। মৌলবি-মাওলানারা নিজে ও তাদের তৈরি ছাত্রছাত্রী সমাজে বেকার অথবা ছদ্ম-বেকার; পরিবার ও সমাজের বোঝা। নিত্য যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। দুহাত পকেটে ভরে আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়ে থাকে। জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা নেই, উচ্চশিক্ষা নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই, প্রযুক্তিগত শিক্ষা নেই, উন্নত শিল্প-ব্যবসা শিক্ষাও নেই– উদ্দেশ্যহীন দুনিয়াদারী করে চলেছে। চিন্তা-চেতনা গোঁড়ামি ও আবেগপ্রবণতায় ভরা। তাদের অনেকে কোনো গঠনমূলক বুঝ নিতে চায় না। তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস এমনই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সে অবস্থা থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনতে গেলে কখনো কখনো তাদের কর্মকাণ্ড উগ্রতায় রূপ নেয়।

শত শত বছর আগে ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার নিয়ে মানুষ যুদ্ধের শক্তিমত্তা দেখাতো। বর্তমানে মানুষ সুপারসনিক রকেটে চড়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাচ্ছে। নিজ দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের শত্রুঘাটিতে রকেট-মারণাস্ত্র ছুঁড়ে অন্যকে ঘায়েল করছে। চোখের পলকে তথ্য বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠাচ্ছে। কোনো তারের সংযোগ ছাড়াই ভূপৃষ্ঠের এক প্রান্তের ঘটনা অন্য প্রান্তে বসে সরাসরি দেখছে। প্রায় সব কাজই মানব জাতি ও সৃষ্টির কল্যাণে হচ্ছে। অথচ বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক কোনো কাজে মৌলবি-মাওলানারা নিজে ও তাদের ছাত্রছাত্রীদের নিযুক্ত করতে রাজি না। তারা বোঝে না, সময় এবং ঘটনাকে পিছনে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। অতীতের ঘটনা ও কর্ম থেকে আমরা শিক্ষা ও আদর্শ নিতে পারি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কাজে-কর্মে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করাটাই বুদ্ধিমানের ও জ্ঞানের কাজ। এজন্য তাদের বিজ্ঞান-ব্যবসাভিত্তিক শিক্ষা নেওয়া দরকার, মন-মানসিকতার গঠনমূলক পরিবর্তন দরকার– তাদের নিজেদের উন্নতির জন্যই তা দরকার, হক্কুল ইবাদের জন্য দরকার, অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই দরকার। নইলে একটা জাতির ধ্বংস অনিবার্য। অপরিণামদর্শী কোনো ভাবাবেগ দিয়ে কোনো প্রাগ্রসর জাতি গড়া যায় না।

ইহলৌকিক জীবনযাপন, সৃষ্টিকল্যাণ, মানবসমাজ ও সৃষ্টিসেবা ছাড়া পরলৌকিক কল্যাণ যে অসম্ভব– তা তাদের বুঝতে হবে। কত হাজারোভাবে যে মানবকল্যাণ ও মানবসেবা করা যায়, তা তাদের ভাবতে হবে। দুনিয়ার মানবকল্যাণ কীসে ও কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে তাদের গবেষণা করতে হবে। তারা জীবনের সকল কাজ-কর্মে, পেশায়, চিন্তা-চেতনায় আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলার নামই যে ইবাদত– এ ধারণা থেকে মুখ ফিরিয়ে ভিন্নমুখী অকর্মণ্য ব্যাখ্যায় গেছে। তাদের মধ্যে কুরআন ও হাদিসের আনুষ্ঠানিকতা আছে– বাস্তব জীবনে প্রায়োগিকতা নেই। আত্মোপলব্ধি, আত্মসংশোধন নেই। সেজন্য 'পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা'কে আংশিক জীবনে পর্যবসিত করেছে। দীনি-শিক্ষার আওতাকে খণ্ডিত করে, জীবনের সংকীর্ণ গলিতে আবদ্ধ করে শুধু পরকালের বিশ্বাস ও বেহেশত নসিবের শিক্ষা বলে মনগড়া ব্যাখ্যা করেছে। বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট (ধর্মীর্য-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত) ও তা থেকে উত্তরণ এবং জয়লাভের উপায় নিয়ে পুরোপুরি বে-ওয়াকিফহাল হয়েছে। তারা থিও-পলিটিক্যাল যুদ্ধের মাঠ আগেই ছেড়ে দিয়ে হেরে বসে আছে; তাই জীবনের প্রতিটা পদে পদে জাতসুদ্ধ নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধমে মানবকল্যাণ ও চেতনার উৎকর্ষই যে এ যুদ্ধে জেতার একমাত্র উপায়– তা মাথায় আসে না, বুঝতেও চায় না। জীবনের বাস্তবতা বুঝতে গেলে, উপলব্ধি করতে গেলেও উপযুক্ত শিক্ষা দরকার। না বোঝার কারণে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা (দুনিয়াদারি) থেকে মুসলমানদেরকে নিজেরাই কোনঠাসা করে ফেলেছে। এসবই মুসলমানদের দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার অভাব; মুখে ধর্মকে 'পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা' বলে মেনে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় অজ্ঞতা; অনগ্রসরতা, কর্মবিমুখতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার পথে চেতনাহীন বাধা; যুগোপযোগী জীবনধারার অন্তরায়। পুরো ইসলামি বিশ্বে এ-ধারা বিদ্যমান; এদেশে এটা আরো বেশি।

এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা থেকে অনেক পিছনে পড়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা (বিজ্ঞানময় কুরআন) ছাড়া জীবন চলে না। অথচ এরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বিধর্মীদের শিক্ষা বলে ফতোয়া দিয়ে, সমস্ত অফিস-আদালত-শিল্প-কলকারখানা-ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়ে নিজেরা ঘরবদ্ধ হয়েছে। তারা অন্যের গলগ্রহ হয়েছে। এতে বস্তুবাদী ও ইহবাদী (সেক্যিউলারপন্থি) শিক্ষার ধারক ও বাহকদের মুসলমান জাতির শোষণের পথকে প্রশস্ত করেছে এবং জাতি হিসাবে মুসলমানদের অস্তিত্বকে খর্ব করেছে। বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করেছে।

এদেশে ইংরেজদের পক্ষপাতদুষ্ট শাসনের আগেও মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন ছিল। বিশ্বের অনেক মুসলিম সভ্যতায়ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জীবনোন্নয়নের ও সৃষ্টিসেবার পাথেয় হিসাবে নেয়া হয়েছিল। এ উপমহাদেশে মাদ্রাসা নামের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও বিজ্ঞান-ব্যবসায় শিক্ষা বাদ দেওয়াতে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একটা অনুন্নত, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীতে ক্রমশই পর্যবসিত করে ফেলছে। সুশিক্ষিত ও মর্যাদাবান জাতি গঠনে ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়গুলো আমাদের ইসলামি চিন্তাবিদ, মৌলবি-মাওলানাদের বিবেচনায় আনতে হবে।

এ বিষয়ে বিচারপতি হযরত শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উসমানীর সন্তান) মুসলিম উম্মহর চিন্তাগত ও আদর্শগত পতন ও বিভাজন থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বলেন, "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতবর্ষে (মুসলমানদের জন্য) বিশেষ তিনটি শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। ক. দারুল উলূম দেওবন্দভিত্তিক শিক্ষাধারা; খ. আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিকেন্দ্রিক পড়াশোনা; গ. দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সিলেবাসকেন্দ্রিক শিক্ষাধারা। যথাসম্ভব ১৯৫০ সনে আব্বাজান রাহ. কোনো সাধারণ এক সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের আলীগড়ের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, নদওয়ারও প্রয়োজন নেই; এমনকি প্রয়োজন নেই দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষাব্যবস্থারও; বরং আমাদের প্রয়োজন একটি তৃতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, যা আসলাফ ও পূর্বসূরীদের ইতিহাসের ধারায় আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবে।' এমন কথা শুনে অনেকেই হয়তো ভ্রু কুঁচকে ফেলবেন। দারুল উরূম দেওবন্দের নুন খাওয়া এক সুবোধ সন্তান, দারুল উলূম দেওবন্দের আস্থাভাজন প্রধান মুফতি কীভাবে এমন কথা বলতে পারেন যে, পাকিস্তানে আমাদের জন্য দেওবন্দের শিক্ষাব্যবস্থারও প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থার! আব্বাজান রহ.-এর এ বক্তব্যটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দূরদর্শিতাপূর্ণ।.. ভারতবর্ষে যে তিনটি ধারা প্রচলিত ছিল তা স্বাভাবিক কোনো ধারা ছিল না; বরং তা ছিল বৃটিশপ্রবর্তিত ধারার প্রতিফল এবং তাদের চক্রান্তের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিকল্প মাধ্যম অবলম্বন মাত্র। নতুবা ভারতবর্ষে বৃঠিশ সম্রাজ্যবাদীদের প্রবেশের পূর্বে মাদরাসা এবং স্কুল নামের দুটি বিজাতীয় ধারার অস্তিত্ব আপনি খুঁজে পাবেন না। এতদঞ্চলে ইসলামের সূচনা থেকে বৃটিশ পিরিয়ডের আগ পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলোতে একসাথে দ্বীনী এবং জাগতিক দু'ধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।" (বর্তমান সময়ে প্রয়োজন নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থা: মুফতি তাকী উসমানি। Our iSLAM24.com; মে ২৯, ২০২১)।

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত মুসলিম দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘেটে দেখলে দেখা যাবে- প্রতিটা দেশেরই একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার ভিত্তিমূলে আছে অন্যান্য শিক্ষার সাথে কুরআন ও হাদিস শিক্ষা। এরপর শিক্ষার্থী তার জীবনের প্রয়োজনে অথবা মেধা অনুযায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যবসায়-বিজ্ঞানসহ শতেক যে কোনো বিষয় নির্বাচন করে উচ্চ-শিক্ষা নিচ্ছে। অথবা টেকনিক্যাল শিক্ষা শিখছে। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের আমখাস জনগোষ্ঠী শিক্ষা-অনিহ। কিন্ত আমাদের দেশের মাদ্রাসাপড়ুয়াদের এ দুর্দশা কেন? তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ও ব্যবসামুখী উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষার সুযোগ কোথায়? শিক্ষার্থীরা অকালেই জীবন ও কর্ম থেকে ঝরে যাচ্ছে। অথচ অসংখ্য কওমি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবিশ্বাস্য প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। পরিবেশের কারণে প্রতিভার বিকাশ হয়নি। কওমি মাদ্রাসার পরিচালকরা বা সেখানে কর্মরত শিক্ষকরা একটু মনোযোগ দিয়ে ভাবলেই বুঝবেন, তাদের ভুলটা কোথায় হচ্ছে। তারা দুনিয়াদারি থেকে (হক্কুল ইবাদ থেকে) অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগতের জীবন, জীবিকা ও কর্ম থেকে, এমন কি এদেশের অফিস-আদালতের প্রতিটা পর্যায় থেকে শিক্ষার্থী ও নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়ে একঘরে হয়ে বসে আছেন। সে সুযোগে অসংখ্য নীতিহীন, অসৎ,

দুর্নীতিবাজ, ইহবাদী, ভোগবাদী লোকজন অফিস-আদালতের প্রতিটা পদ ও সমাজ দখল করে নিয়েছে। তাই জনসাধারণের ভোগান্তি বেড়েছে। সরকারি সম্পদ নয়ছয় হচ্ছে।

আসলে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুসলমানেরা একটা আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিনাশী জাতি হয়ে পড়ে পড়ে ধুকছে। এদের চৈতন্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত, বিজ্ঞান, ব্যবসা ও প্রযুক্তিগত মানসম্মত শিক্ষায় জ্ঞানার্জন না করা পর্যন্ত, শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক বৈশিষ্ট্য অন্তরে না আসা পর্যন্ত সারা বিশ্বে এমন-কি বাংলাদেশেও মুসলমানরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। এদেশের মানুষকে যদি পরতন্ত্র ও কতিপয়তন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন রাখতে হয়, দেশের স্বাধীনতাকে যদি অক্ষুণ্ন রাখতে হয়– তাহলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরাচারবৃত্তি ছেড়ে এদেশের মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে জাতীয় চেতনায় অখণ্ডতা, সংহতি ও উৎকর্ষ বাড়ানো আশু প্রয়োজন। এ উপলব্ধি এদেশের প্রতিটা সচেতন নাগরিকের থাকতে হবে। এ উপলব্ধি থেকে একটু পিছপা হলেই এ জাতির ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাবে, কালের পরিক্রমায় টিকতে পারবে না। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা না থাকলে যে, পরিণামে এ জনগোষ্ঠী অন্য কোনো সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠীর হুকুমবরদারে পরিণত হবে– এ বোধশক্তি মগজে জোরালোভাবে ঠাঁই দিতে হবে এবং নিজেদের মুক্তি কীসে সে-পথে হাঁটতে হবে।

এদেশে একটা শিক্ষাসমাজ তৈরি হওয়া দরকার, যে সমাজ ধর্মীয় শিক্ষার সাথে ব্যবসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড ও ইউনিফায়েড শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে। ইহকালের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থের সদ্ব্যবহার, সুশিক্ষা, কর্ম, পেশাগত দায়িত্ব পালনও ধর্ম ও ইবাদতের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা বোঝাবে। প্রতিটা মানুষেরই ধর্ম ছাড়াও সমাজে আলাদা একটা মর্যাদাশীল পেশা থাকতে হবে, তা বোঝাবে। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে সুশিক্ষিত, সুপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করবে। তাহলে এই অমানিশার ঘোর আধার কেটে গিয়ে মৃতপ্রায় এই সমাজ-বৃক্ষ সূর্য-সারথি অরুণিম আলোর বর্ণচ্ছটায় আবার কচি-কিশলয়ে ভরে যাবে।

(১৮ অক্টোবর '২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।